International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-II, March 2024, Page No.40-45
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i2.2024.40-45

নৌ তৎপরতা, জলযান বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

পায়েল নন্দী

সহকারী অধ্যাপিকা, বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা, ভারত

Abstract:

This research paper delves into the Naval Tradition in the context of History of Bengal. According to Max Muller,' A people that can feel no pride in its past history and literature, loses the mainstay of its national character. "Bengal had glorious naval tradition and the Bengalis played very important role in the maritime activities. Due to the fact that they lived near sea and navigable rivers the Bengalis specifically those of South and Eastern Bengal acquired the fame of being a maritime people from the earliest times. The glorious naval tradition of Bengalis was growing up not only for the nearness of the sea but also for the spirit of adventure. History of naval tradition is a very important and significant research field. This article sheds light on the history of naval tradition of Bengal. This paper examines various historical texts, scholarly articles, and also contains a review of relevant literature, identify the research gap, and formulate the research questions and hypothesis. The findings demonstrate that the naval tradition of Bengal has a long history starting from ancient days to Middle Ages. Even during the Mughal rules landlords of Bengal known as 'Bhuiyas' carried out the tradition of naval establishment.

Keywords: HISTORY – BENGAL – MARITIME ACTIVITIES – NAVAL TRADITION – SEA – BOAT – MUGHAL – BHUIYAS.

সূচনা: বাংলার নৌবহর ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহিত্য, পটচিত্র, স্থাপত্য, শিলালেখ প্রভৃতি উপাদান থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি লেখকরা বাংলার সামুদ্রিক অভিযান, নৌ অভিযান সর্ম্পকে বিশেষ কিছু পদ ও কবিতা রচনা করেছিলেন। এমনকি বিদেশী পর্যটক যারা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সর্ম্পকে বর্ণনা দিয়েছন যেমন, মেগাস্থিনিস, স্ট্রাবো, টলেমি, প্রমুখরা বাংলার এই নৌ অভিযানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। যদিও এই তথ্যগুলি খুবই অপ্রতুল।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ নদী বিধৌত এবং সমুদ্র পরিবেষ্টিত ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলা সমুদ্র বাণিজ্য তথা নৌ বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বহু নদ-নদীর সান্নিধ্য বাংলার সামাজিক,অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল। এইসময় বাংলার কিছু নগরের উত্থান ঘটেছিল যেগুলি বিশেষভাবে নৌযাত্রা, বন্দর, সমুদ্র বাণিজ্য প্রভৃতি প্রক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য তাম্রলিপ্ত (মূলতঃ মুঘল যুগের পূর্ব পর্যন্ত), সাতগাঁও (ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত), সোনারগাঁও প্রভৃতি।

বাংলার এই নৌযাত্রা ও সামুদ্রিক অভিযানের পশ্চাতে শুধু যে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজন্যবর্গের অনুপ্রেরণা ছিল তা নয়, বরং প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলার বণিকরা এই নৌ যান ও সমুদ্র অভিযানকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে এবং এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। প্রাচীন বাংলার সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, বাংলার বণিকরা বাণিজ্যের প্রয়োজনে প্রায়শই জাভা, সুমাত্রা, চীন,জাপান এবং কখনো কখনো স্কটল্যান্ড, রাশিয়ার মতো দূরবর্তী দেশেও পৌঁছে যেত, দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মিত জলযান বা নৌকার মাধ্যমে।

ফলে একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলার সমুদ্র অভিযান ও সামুদ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে জলযান বা বিভিন্ন প্রকারের নৌকার ও জলযানের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে ও গবেষণার পরিসরকে প্রসারিত করে।

স্থানীয়ভাবে যে সকল নৌকার নাম প্রাচীন বাংলার ও মধ্যযুগের বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় তার মধ্যে অন্যতম হল ঘাসি, মালার, পালোয়ারি, পাটম, জঙ, ডোরাখা, কাঠামি এবং পানসি। এই সকল নৌকার মধ্যে অনেকগুলি হল ডিঙি অথবা একমল্লাই নৌকা। সপ্তগ্রাম ছিল বাণিজ্যের জন্য সর্বপ্রধান বন্দর। এখানে সদাগরী ডিঙার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। যে সকল সদাগরী ডিঙা আশি গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গেয় দুকুল এবং কোন কোন ডিঙায় বহুসংখ্যক দাঁড় ছিল। প্রতাপাদিত্যর সময়ে যশোহরে জাহাজ নির্মাণ হতো। ডিঙ্গি, পানসা, বাছাড়ী, বালাম ছিল যশোহরের নৌকা। বালাম নৌকায় বাংলার চাল বিদেশে রপ্তানী হতো। এইসকল সদাগরী জলযানের পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাসে যুদ্ধ নিমিত্তেও জলযান নির্মাণের ও ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য, কল্যাণ (বন্দুক ও কামান বহন করত), কাঞ্চনমালা (বারুদ বহনকারী), গুয়াধর (সৈন্য বহনকারী), হংসনাদ (লেঠেল বাহিনীর), লক্ষ্মীধর প্রভৃতি।

বছরের নির্দিষ্ট একটি সময় নদীতে নৌকা চলাচলের পক্ষে উপযোগী—জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সব থেকে খারাপ সময় হল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। অনুকূল আবহাওয়া ও জলের স্রোত নৌকা চলাচলের পক্ষে একান্ত উপযোগী। পাবনা থেকে পাট নিয়ে ঢাকায় যেতে পাঁচদিন লাগে। আর বাতাস ও জলের স্রোত যদি নৌকার বিপরীতে থাকে তাহলে লাগবে কুড়ি দিন।

কাঠের উৎকর্ষের উপর নৌকার আয়ু নির্ভর করে। সেগুন ও শালের নৌকার আয়ু ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর। নিম্নমানের কাঠের আয়ু হল দশ থেকে পনের বৎসর। শীতকাল হল নৌকা তৈরির সবচেয়ে ভালো সময়। সূত্রধরেরা চেষ্টা করে নৌকার কাজ বর্ষার আগেই শেষ করতে।

হিন্দুদের মধ্যে শূদ্ররাই সূত্রধরের কাজ ভালো করতে পারে। পরবর্তীকালে দারিদ্র্যের জন্য বাঙলাদেশের মুসলমানরাও সূত্রধরের কাজে যুক্ত হন। পাবনা, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ অঞ্চলের সূত্রধরেরা প্রধানত হিন্দু। অপরদিকে স্বরূপকাঠির কারিগরেরা প্রধানত মুসলমান। যে সমস্ত নৌকার তলটা সমতল তা প্রধানত মুসলমান কারিগরেরা তৈরি করে।

নৌকা তৈরির কাজে যে টাকার প্রয়োজন (কয়েক হাজার টাকা) তা অল্প কয়েকজন সূত্রধরই যোগাড় করতে পারে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে নৌকা তৈরি করতে সূত্রধরদের মজুরি ছিল ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকা; খোরাকি দেওয়া হত না। খোরাকি দিলে ১৫ থেকে ২০ টাকা কম পেত। দক্ষতার উপরেই তাদের মজুরি নির্ভর করত। অনেক সময় নির্দিষ্ট টাকার চুক্তিমত তাদের নৌকা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হত। যখন নৌকা তৈরির কাজ থাকত না, তখন অন্য আসবাবপত্র তৈরি করে তারা জীবিকা অর্জন করত। কয়েকজন অবশ্য সূক্ষ্ম কাঠের কাজে বেশ পটু।

ঘুরাব (Grab) সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত ও শক্তিশালী। উর্দ্দু ঘুরাব শব্দে কাক পক্ষী বোঝায়। এতে সাধারণতঃ দুটি এবং বড়গুলোতে তিনটি মাস্তুল থাকে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে এটি বেশ প্রশস্ত। 'বলিয়া' নৌকা বোধহয় আমরা যাকে 'ভাউলিয়া' বলি, সেইরকম ছোট, লম্বা, একপাশে ছইওয়ালা দ্রুতগামী নৌকাকে বোঝায়। 'পাল' বলতে খুব সম্ভবতঃ ঢাকা থেকে আমদানী 'পলওয়ার' নৌকাকে বোঝাতো; এতে একটি মাত্র প্রকাণ্ড মাস্তুল থাকে এবং অত্যন্ত বোঝাই ধরে। 'মাচোয়া' (সম্ভবতঃ Massoola boat) নৌকার তক্তাগুলি কাতা বা শণ দিয়ে বেঁধে প্রস্তুত করা হতো এবং তার ফলে তরঙ্গের বেগ সহ্য করতে পারতো। এ জাতীয় নৌকা মাদ্রাজের উপকূলে ব্যবহৃত হতো। 'পশতা' (Fusta) একপ্রকার মাস্তুলিয়া দ্রুতগামী জাহাজ। জলিয়া নৌকা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ব্যবহৃত হতো। এর উপরে পাতলা বাঁশের পাটাতনের দুই পাশে ৪০/৫০টি পর্যন্ত দাঁড় বসানো থাকতো; বৃহদাকারের জালিয়া বা জলবাগুলিতে ৬টি বা ৭টি পর্যন্ত ছোট কামান পাতা থাকতে পারতো। পিয়ারা নৌকাগুলি ময়ূরপঙ্খী বা সুন্দর বজরার মত। তার ভিতরে আরোহীগণ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারতো। মহলগিরি তরণী পিয়ারা অপেক্ষাও সুন্দর ও বড়ো। সেখানে রাণী বা উচ্চবংশীয় মহিলারা আরোহণ করতো। বেপারি নৌকা বাণিজ্যের জন্য এখন ব্যবহৃত হয়। এটি ঘুরান হইওয়ালা এবং সামনে কয়েকটি দাঁড় এবং মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মাস্তুল থাকে। অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি বহনের জন্য এ সব নৌকা যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় ছিল।

এই সকল নৌকা ব্যতীত সংবাদাদি প্রেরণের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী সিপ নৌকা, ভারী দ্রব্য ও হাতী ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু বহনের জন্য ঢাকাই পাটুয়া, ভড় বা জঙ্গ নৌকা ব্যবহৃত হতো। পাতিল নৌকা উত্তর পশ্চিম দেশ থেকে আসতো এবং মোগলবাহিনীতে রসদ বহনের জন্য তা ব্যবহৃত হতো। প্রতাপাদিত্যের নৌ বাহিনীতে ঘুরাব, জালিয়া, বালান, পলওয়ারী ও কোশার সংখ্যাই অধিক। তারমধ্যে ঘুরাব, কোশা ও জালিয়া প্রকৃত রণতরী। অপরগুলি অধিকাংশই ভারবাহী।

এই সকল জাহাজ ও নৌকা গঠন করতে প্রতাপাদিত্যের আর একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। সুন্দরবনে পোতনির্ম্মাণের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল না। তারমধ্যে সুন্দরীকাঠই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঘুরাব প্রভৃতি প্রধান জাহাজগুলি অন্য দেশের মতো শাল সেগুনে তৈরী করা হতো।

যশোহন দূর্গ থেকে ৪/৫ মাই উত্তরে একটি স্থান নির্দিষ্ট হলো এবং সেখানে নৌবিভাগের কার্যালয় স্থাপিত হলো। প্রথমতঃ বাঙালি বা উজবেগ জাতীয় কর্ম্মচারীর অধীন কার্যারম্ভ হয়েছিল। নৌবিভাগের প্রধান কার্যালয়ের নাম হয়েছিলো জাহাজঘাটা। জাহাজঘাটা থেকে একটু উত্তর দিকে গিয়ে যমুনার পশ্চিম পাড়ে দুধলি ডক্ বা পোত নির্ম্মাণ স্থান। কর্ম্মাধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ডুডলির নামানুসারে এই স্থানটির নাম হয়েছে দুধলি, এই স্থানে পূর্ব্বদিক থেকে একটি খনিত খাল এসে যমুনায় মিশেছে এবং তা অপর পার থেকে বরাবর পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এই খাল থেকে উত্তর পূর্ব্ব মুখে একটি পাশখালি বের করে একটি কৃত্রিম হ্রদে

মেশানো হয়েছিল। বড় বড় জাহাজ সংস্কারের জন্য এই খাল দিয়ে এসে এই হ্রদে নামতে পারতো; এবং সেখানে প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়ে, হ্রদটিকে শুকনো করে জাহাজের তলদেশ পরীক্ষা বা সংস্কার করা হতো। খালের মুখ বরাবর উত্তরদিকে নদীর পশ্চিম পাশ দিয়ে বড় পুকুরের মতো কতকগুলি খাত কাটা বয়ে গেছে। দুই দুইটি পাতের মধ্যবর্ত্তী স্থান এখনও পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, মধ্যযুগে বাংলার নৌশিল্প মোটামুটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে অবস্থান করেছিল। নদী সন্নিহিত বনাঞ্চলই ছিল এ শিল্পের বিকাশক্ষেত্র। হিসাব নিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গে নৌশিল্পের উন্নতিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে বিপুল কাষ্ঠসম্পদে পরিপূর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল। ভারবহনক্ষম নৌযান নির্মাণে ঐ বন থেকে প্রচুর সুন্দরী কাঠ পাওয়া যেতো, আর মিলতো দক্ষ মিস্ত্রী। তবে এই সময়টায় আরাকানী মগদের পাশাপাশি পর্তুগীজ বোম্বেটেদের জলদস্যুদেরচারিতায় দূর প্রাচ্য ও ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে বাংলার, তার পরিবর্তে আরবীয় বণিককূল ও বিদেশী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাদাররা বাংলার উপকূলের বন্দরগুলিতে নিয়ে আসতে শুরু করেছেন নিজেদের বিপুল বাণিজ্যতরী। তাই মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায় সাগরফেনা, মোহন গিরি, উদয়তারা, কাজলরেখা, দুর্গাবর, লক্ষধর, হংসমুখী, সিংহমুখী, ব্যাঘ্রমুখী, রাজবল্লভ প্রভৃতি নামধেয় যেসব বর্হিবাণিজ্যমুখী বাঙালি বণিকের পণ্যবাহী ডিঙার উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে স্বভাবতই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে যে কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনার মিশেলে এগুলির নির্মাণকার্য সমাধা করেছিলেন তাতে কোন সংশয় নেই। প্রাচীন যুগের সমৃদ্ধবাণিজ্যের স্মৃতিই হয়তো মঙ্গলকাব্যের আদিগল্পগুলিতে উঁকি ঝুঁকি মেরে থাকবে।

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের বণিক আখ্যান দুটি ছাড়া অন্নদামঙ্গলে একটুখানি নৌকার প্রসঙ্গ বলে। অবশ্য সেখানে নৌকার চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে নৌকার মাঝি। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কবিত্বের আলো দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছেন হতদরিদ্র ঈশ্বরী পাটনীকে। এ মানুষটিকে নিয়ে কাব্যরসিক মহলে আলোচনার অন্ত নেই। তিনি স্ত্রী না পুরুষ এ জাতীয় লোক ঠকানো প্রশ্ন থেকে শুরু করে ঈশ্বরী পাটনীর অমর বাৎসল্য দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত হয়ে এসেছে।

বাংলার সামুদ্রিক তথা নৌ কার্যকলাপের ইতিহাসে বারো ভুঁইয়াদের উল্লেখ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় মুঘল শাসনের প্রথম শতকে বাংলায় এক বিশেষ প্রায় স্বাধীন জমিদার গোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছিল যারা পরিচিত ছিল বারো ভুঁইয়া নামে। এবং এই বারো ভুঁইয়ারা তাদের বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন, উচ্চমানের নৌ বাহিনীর মাধ্যমে বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেছিল। এই সকল বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, ইশা খাঁ, কেদার রায়, মুসা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকেই বহু যুদ্ধ নৌকা, এবং সমর নৌযানের অধিকারি ছিলেন। যুদ্ধের সময় রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতির সঙ্গে বেপারি, কোশা, বালিয়া, পাল, ঘুরার, মাচোয়া, পশতা বা ডালিয়া জাতীয় নৌকার ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের উৎকৃষ্ট রণতরীর সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। অন্যান্য পোতের সংখ্যা ছিল তারও বেশী। ইসলাম খাঁর নবাবী আমলে আবদুল লতীফ নামক যে ভ্রমণকারী নতুন দেওয়ানের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর বর্ণনায় জানা যায়, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা ছিল।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের যে নৌ তৎপরতা ও সামুদ্রিক কার্যকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্যসূত্রে, সেই নৌ তৎপরতা, জনযান, নৌকা নির্মাণ, সামুদ্রিক কার্যকারিতা মুঘল শাসনের সময়কালে

বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল জানা যায়। বিভিন্ন পর্যটক যারা মুঘলযুগে ভারতে এসেছিলেন এবং তৎকালীন বাংলাদেশ সর্ম্পকে তাদের বক্তব্য রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জাহাঙ্গীরের আমলে সেবাস্টিয়ান মানরিক। যিনি তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি রণতরী ও বাণিজ্যতরীর নাম উল্লেখ করে গেছেন তাঁর লেখায়।

তাঁর লেখায় মেলে যাত্রীবাহী নৌকার নাম পোর্ক ও রসদবাহী প্রমোদবিহারের নৌকা পতেলার কথা। শাহজাহানের সময়কালে আগত, টাভার্নিয়ের এর লেখায় ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রণতরী নির্মাতা এক শ্রেণীর কারিগরের কথা জানা যায়। বাঙলায় মোগল শাসনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, সম্রাট আকবরের সময় থেকে প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে নৌ তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঢাকা নৌ নির্মাণ সর্ববৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মির্জা নাথনের লেখা বহারিস্তান-ই-গায়বী থেকে জানা যায় গোধা, সারেঙ্গা, সাম্পান ও কোন্দা নামক মালপত্র ও যাত্রী পরিবহণকারী নৌকার নাম।

প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার এই নৌ তৎপরতা এবং বিশেষ করে বিভিন্ন নৌকা ও জলযানের যে বিস্তৃত ইতিহাস তাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ পরিসরে গবেষণা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই পরিসরে আংশিক প্রান্তিকস্তরে পর্যবসিত বিষয়বস্তু তথা প্রাচীন তথা মধ্যযুগের বাংলার নৌ ঐতিহ্য, নৌযানের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে তাকে নতুনভাবে উপস্থাপনার প্রয়াস করা সম্ভব।

সাহিত্যের পর্যালোচনা: বাংলার নৌ তৎপরতার ঐতিহ্য ও জলযানের বৈশিষ্ট্য, সামুদ্রিক কার্যকলাপের সর্ম্পকে একদিকে যেমন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বহু তথ্য পাওয়া যায়। সেরকমই বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন সময়ে এই সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্য, চন্ডীমঙ্গল কাব্য, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গীতিকবিতা, প্রাচীন বাংলার গান, ছড়া প্রভৃতিতেও এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও সেই তথ্য খুবই অপ্রতুল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ যেমন, 'The History of Bengal' Vol-I, Ramesh Chandra Majumder (edited), The University of Dacca দ্বারা মুদ্রিত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সর্ম্পকে বিস্তৃত জানা যায়।

দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থটিও এই বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

রাধাকুমুদ মুর্খাজী রচিত 'Indian Shipping' A History of the Sea-Borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times, Kitab Mahal দ্বারা মুদ্রিত। গ্রন্থটি এই বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি থেকে প্রাচীন ভারত তথা বাংলার নৌ ঐতিহ্য, জলযানের বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান সময়ে রণবীর চক্রবর্তী তাঁর বহু গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নৌযাত্রা, সামুদ্রিক কার্যকারিতার উপর আলোকপাত করেছেন যা বিশেষভাবে প্রাচীন বাংলা বা মধ্যযুগের বাংলার নৌ তৎপরতার ঐতিহ্যের বিষয়ে স্বতন্ত্র্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

স্বরূপ ভট্টাচার্য, 'মধ্যযুগে বাংলার নৌকা' নামক প্রবন্ধটিতে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যা এই বিষয়ে ভবিষ্যত গবেষণার পরিসরকে প্রশস্ত করে।

নীহার মজুমদার রচিত 'এবং বাংলার লৌকিক জলযান', আত্মজা প্রকাশনী, থেকে বাংলায় নৌ তৎপরতার ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায় সর্ম্পকে বিশেষ জ্ঞান লাভের পরিসর নির্মিত হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: এই বিষয়টি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচিত হলেও সেগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতা থেকেই যায়। ফলত, বাংলার ইতিহাস ও নৌ তৎপরতা, জলযান সংক্রান্ত গবেষণা ও বৃহৎ পরিসরে আলোচনার সাপেক্ষে অধিক তথ্য অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: বিভিন্ন তথ্যসূত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাস কিভাবে কতগুলি পর্যায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগবিভাগের সাপেক্ষে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাপেক্ষে এই নৌ তৎপরতার ঐতিহ্য, জলযানের মতো প্রেক্ষিতগুলির পরিবর্তন, অভিযোজন সম্ভব হয়েছিল। তার উত্তর খোঁজার অনুসন্ধিৎসা তৈরী হয়।

সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত: সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে, মনে করা যেতেই পারে বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ বা তারও পরবর্তী সময়কালে, বাঙালীর সামুদ্রিক কার্যকারিতা বিভিন্ন লৌকিক জলযান, রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা সমগ্র বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপরেই তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গবেষণার পদ্ধতি: এক্ষেত্রে মূলতঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রভৃতিকে গৌন উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা এবং বাংলার শিলালেখ, দলিল দস্তাবেজ, ভূমিদান পত্র, প্রভৃতিকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আহরণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিটি গ্রহণের প্রয়াস করা হবে।

উপসংহার: সামগ্রিক অর্থে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার নৌতৎপরতা তথা সামুদ্রিক কার্যকারিতা বিশেষত বহু প্রকারের জলযানের যে ঐতিহ্যের কথা জানা যায় বিভিন্ন উপাদানের পর্যালোচনার ভিত্তিতে তার ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর সেই প্রাসঙ্গিকতা থেকেই এই প্রবন্ধটির অবতারণা।

তথ্যসূত্র:

১) রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'The History of Bengal' Vol-I, The University of Dacca.
২) রাধাকুমুদ মুখার্জী, 'Indian Shipping', Kitab Mahal Private Limited, 1962.
৩) দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪) দীনেশচন্দ্র সেন, History of Bengali Language and Literature, জ্ঞান পাবলিশার্স, ২০০৭।
৫) নীহার মজুমদার, এবং বাংলার লৌকিক জলযান, আত্মজ প্রকাশনী, ২০১৮।
৬) স্বরূপ ভট্টাচার্য, মধ্যযুগে বাংলার নৌকো, সপ্তডিঙা, বিশ্বকর্মা পুজো সংখ্যা, ১৪২৬।